ATHENA, VOLUME IV, JULY 2020 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 112-120
www.athenajournalcbm.in

দক্ষিণবঙ্গের নির্বাচিত ব্রতে উর্বরতাকেন্দ্রিক ধারণা ও লোকজীবনে এর প্রভাব

শর্মিষ্ঠা পাইক*

প্রাপ্ত: ০৯/০৫/২০২০ পরিমার্জন: ০৮/০৬/২০২০ গৃহীত: ০১/০৭/২০২০

সারসংক্ষেপ: *'উর্বরতা' বলতে আমরা মূলত মৃত্তিকার উর্বরতাকে বুঝি। আর কৃষির সাথে মৃত্তিকার উর্বরতা ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। আদিম মানুষ কৃষির জন্য উর্বর মৃত্তিকা যে কতটা সহায়ক এটা অনুধাবন করতে পেরে প্রথমে নদীতীরেই তাদের স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল। মৃত্তিকার উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তি একে অপরের পরিপূরক। তবে এর মাঝেও এককথায় বলা যেতে পারে উর্বরতা শব্দের অর্থ বৃদ্ধি। মানুষ সেই প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ্য করতে শুরু করল উদ্ভিদ জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক। যে গাছ যত বেশি আশ্রয়ের উপযুক্ত, যা অধিক ফলদানকারী, যে গাছ একই সাথে অনেক চারাগাছের জন্ম দেয়, এমন গাছই আদিকাল থেকে হয়ে উঠেছে মানুষের আরাধ্য, যা তার উর্বরতাকে বহন করে। মূলত কৃষিকার্য আবিষ্কৃত হওয়ার পর উর্বরতা কেন্দ্রিক ধর্মচেতনার বিকাশ ঘটল। সবচেয়ে শক্তিশালী উর্বরতা তান্ত্রিক যাদু বিশ্বাস গড়ে উঠেছে নারীশক্তির উর্বরতাকে কেন্দ্র করে। আর এই ফসল উৎপাদন তথা ধরিত্রীর উর্বরতার সাথে নারী দেহের উর্বরতা তথা সন্তান উৎপাদনের ধারণা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সন্তানের জন্মদানের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ও ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ ও প্রকৃতির ভূমিকার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে আদিম মানুষের মধ্যে এক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের সূত্রপাত ঘটে। ফসল উৎপাদন ও সন্তানের জন্ম এই দুই ঘটনাই ধরিত্রী ও মানবশরীরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হওয়ায় আদিম মানুষের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে এক সমৃদ্ধশালী যাদুবিশ্বাসের জন্ম হয়। তাই উর্বরতা তান্ত্রিক যাদুবিশ্বাসের হাত ধরে নারী ও প্রকৃতি মিলেমিশে হয়ে গেছে একাকার।*

সূচক শব্দ: *উর্বরতা, ধরিত্রী, উর্বরাশক্তি, নারীদেহের উর্বরতা, উর্বরতাতান্ত্রিক যাদুবিশ্বাস।*

---

* পিএইচ.ডি. গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া।
e-mail: sarmisthapaik2017@gmail.com

ভূমিকা

খাদ্য সংগ্রহকারী ও শিকারজীবি স্তর থেকে মানুষের উৎপাদন প্রক্রিয়ার উদ্বর্তন ঘটল পশুপালন এবং কৃষিকর্মের পর্যায়ে। যাযাবর গোষ্ঠীরূপেই নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ চাষপালা শুরু করেছিল খ্রী: পূর্ব ১০,০০০ বছর আগে। কিন্তু হাজার দুই বছরের মধ্যেই যখন মানুষ খাদ্যের উৎপাদন পদ্ধতি হিসাবে কৃষির আবিষ্কার করতে শিখল তখন থেকেই কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি গড়ে উঠল। আর যারা এটা গ্রহণ করতে পারল তারাই জনপদ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হল। আর যাদের অর্থনীতি গণ্ডীবদ্ধ থেকে গেল পশুচারণাতেই, তারা যাযাবর হয়েই জীবন যাপন করতে লাগল।

সমাজ কাঠামোর এই পরিবর্তনটা ধর্মবিশ্বাসকেও বদলাতে শুরু করল। কৃষিকে অবলম্বন করে যে অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হল, তার ধর্মধারায় আদিম মাতৃকাতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হল নূতন একটি কাল্ট: উর্বরতা তন্ত্র (Fertility Cult) আর এই নূতনতর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী এবং পৃথিবী সমার্থবোধক হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে শস্যকামনা তথা শস্য উৎপাদন ও সন্তান কামনা তথা সন্তান সৃজন সমধর্মী কাজ বলেই সমাজ জীবনে প্রচলিত হল।

উর্বরতা তন্ত্রের উৎস-বিবর্তন

Fertility Cult -এর মূল ধারা কয়েকটি: মাতৃকা উপাসনা, উর্বরতাতন্ত্র, যৌন-প্রতীক উপাসনা এবং পূর্বপুরুষের স্মৃতিপূজা। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি আবার পরস্পরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সন্তান এবং শস্য এই দুই এর যখন প্রয়োজন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে তখন ঐ দুইকে নিয়ে একটা কাল্ট গড়ে উঠবে তাতে আর সংশয় কী? আবার এই দুই এর ক্রমবিবর্তনের ফলশ্রুতিই হল যৌন-প্রতীক পূজা। ক্ষুধার নিবৃত্তি (অতএব শস্য), নিরাপত্তার আশা, দলের সংখ্যা বৃদ্ধি (অতএব সন্তান) এবং যৌনাবেগ পরিতৃপ্তি (সুতরাং যৌন প্রতীককে দেবতাকল্প ভাবা) এই তিন মৌলিক জৈব প্রবণতা বা বেসিক আর্জ -এর লব্ধ ফল হল প্রাসঙ্গিক কাল্টগুলি।

সভ্যতার আদিযুগে ভয়াল প্রকৃতির বুকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে থাকা আদিম মানুষের অনিশ্চিত জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা। তাই চারপাশের বহু ফলদানকারী বৃক্ষ, বহু সন্তানদানকারী জীবজন্তু ও নানা সরীসৃপই তাদের আরাধনার একমাত্র বিষয় হয়ে উঠেছিল এই সময়কালেই পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে কেন্দ্র করেই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল যাদুবিশ্বাসের। উর্বরা শক্তির বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আদিম যাদুবিশ্বাসে ভর করে বহু ফসলদানকারী গাছপালা, বহু সন্তানদানকারী জীবজন্তু ও সরীসৃপ এরা হয়ে উঠেছে আরাধ্য। আবার কালক্রমে উর্বরতা চিহ্ন হিসাবে এগুলিই স্থান করে নিয়েছে ব্রতের আলপনায় শুভকারী চিহ্ন হিসাবে। আদিম সমাজের উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে প্রত্ন প্রস্তর যুগের নারীমূর্তিগুলিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই মূর্তিগুলির যৌনঅঙ্গগুলি অত্যন্ত বিকশিত ও সুস্পষ্টভাবে রূপায়িত ছিল। আর উর্বরতা তন্ত্রের বিষয়টি থেকে পরবর্তীকালে এসেছে যৌন প্রতীক বা লিঙ্গ পূজার ধারণা। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে গড়ে ওঠা সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক আর এই সভ্যতায় মহামাতৃকা দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল। এই মাতৃকা দেবতার উপাসনাও ছিল উর্বরতা কেন্দ্রিক কর্মধারার মধ্যে।

উর্বরতা কেন্দ্রিক সংস্কৃতির প্রাথমিক ধারণা নানা পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে আজও বর্তমান আধুনিক সমাজে নিঃশব্দে অবস্থান করছে। উদাহরণ বলা যেতে পারে যে কোনো পূজা পার্বণ বা বিবাহের অনুষ্ঠানে সদর দরজায় রাখা কলাগাছ ও জলভরা ঘট উর্বরতা কেন্দ্রিক সংস্কৃতির বিবর্তনের সাক্ষী। 'কলাগাছ' একদিকে উর্বরতার প্রতীক জাত বহুফসল দানকারী উদ্ভিদ অন্যদিকে 'জলভরা ঘট' সন্তানসম্ভবা গর্ভবতী নারীর দ্যোতক। উভয় বিষয়ই সংসারের সম্পদবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক সুতরাং বলা যেতে পারে বর্তমানে অধিকাংশ পূজা পার্বণ বা ব্রত অনুষ্ঠানই উর্বরতার প্রতীকজাত। এবং এগুলির উদ্‌যাপন জন বৃদ্ধিজনিত আগ্রহের ধারক ও বাহক। আদিম সমাজে যে জনসংখ্যা ছিল তাদের কাছে কাঙ্খিত ঐশ্বর্য, বর্তমান সমাজ বিবর্তনের পথ ধরে সেই কাঙ্খিত ও ঐশ্বর্যের চেহারা গেছে বদলে। গুহা মানবের

কাঙ্খিত সেই 'জনসংখ্যা' কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতায় এসে দাঁড়িয়েছে 'ফসল' এবং আরো বিবর্তিত হয়ে তার চেহারা ধনসম্পত্তি ও সমৃদ্ধিতে এসে ঠেকেছে। সুতরাং বিবর্তনের পথ ধরে বাইরের চেহারা যাই হোক না কেন এর অন্তরালে উর্বরতা কেন্দ্রিক ধারণাই সমানভাবে আজও বিদ্যমান।

বঙ্গীয় প্রেক্ষিতে উর্বরতা কেন্দ্রিক লোকাচার ব্রত ও পার্বণ

কৃষিকেন্দ্রিক বঙ্গদেশে ক্ষেত্র বা জমি উর্বর করার কামনায় প্রাচীনকাল থেকেই নানা লোকাচার পালিত হয়ে আসছে। বাংলার প্রাচীন মেয়েলী ব্রত উৎসবের মধ্যেও এই ধ্যান ধারণার পরিচয় আমরা পাই। এর মধ্যে একদিকে যেমন থাকে মানুষের কামনা বাসনা অন্যদিকে থাকে সমাজ জীবনের বাস্তব প্রতিফলন। সারা বাংলা জুড়েই খেত উর্বর করার কামনায় নানা ব্রত ও লোকাচারের প্রচলন আছে। তবে বর্তমান প্রবন্ধে শুধুমাত্র দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে যে সকল ব্রত ও লোকাচার পালিত হয়ে থাকে তারই ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা হবে-

উর্বরতা তন্ত্রের দ্বারা চালিত ও কৃষিজমির উর্বরতার কামনায় দক্ষিণবঙ্গে যে ব্রত ও লোকাচারগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ:

১। করম ও জাওয়া উৎসব
২। অম্বুবাচি ব্রত
৩। কার্তিক ব্রত
৪। নলপুজো / নলব্রত
৫। ভাঁজো
৬। ইতুব্রত
৭। তুষ-তুষলী ব্রত
৮। বড়ির বিয়ে
৯। ডাক সংক্রান্তি

ইতুব্রত

দক্ষিণবঙ্গে ইতুব্রত পালিত হয় অগ্রহায়ণের রবিবারে। রবিবার অর্থাৎ সূর্যের বার। কৃষির সঙ্গে তথা মাটির উর্বরতার সঙ্গে সূর্যের এক ওতোপ্রোত সম্পর্ক আছে। পশ্চিমবঙ্গে ইতুর ব্রত প্রকৃতপক্ষে সূর্যেরই উপাসনা। আবার অনেকের মতে 'ঋতু' শব্দটিও 'ইতু' শব্দের মূল হতে পারে। প্রতি রবিবার এই ব্রত পালন করতে হয়। লক্ষণীয় বিষয় হল রবি যা সূর্যের অপর নাম। ইতুব্রত সাধারণত রমণীরাই করে থাকেন। একটি মাটির সরায় ভিজে মাটিতে ধান, যব, গম, সরষে, ছোলা বা মটরের দানা নিয়ে অন্যান্য অঞ্চলে রবিশস্যের দানা রোপণ করা হয়। অগ্রহায়ণের প্রতি রবিবার উক্ত সরায় গঙ্গাজল বা বিশুদ্ধ জল সিঞ্চন করা হয়। এর ফলে শস্যদানাগুলি সহজেই অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমেই ছোটো ছোটো সজীব উদ্ভিদে পরিণত হয়। এই ইতুব্রত কার্ত্তিক সংক্রান্তি থেকে শুরু করে অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিতে গিয়ে সমাপ্ত হয়। শস্যপূর্ণ সরাটি গঙ্গা অথবা কোনো জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়। ইতুপুজোর মাধ্যমে ইতু সূর্য, ধরিত্রী যারই পুজো হোক না কেন বাংলার ইতুপূজা বা ব্রত মূলত কৃষি বা শস্য বন্দনা। এর আড়ালে রয়েছে উর্বরতা কেন্দ্রিক বিশ্বাস। সন্তান ও সম্পদ কামনাই এই ইতুপূজার মূল উদ্দেশ্য।

তুষ-তুষলী ব্রত

খেত উর্বর করার কামনায় দক্ষিণবঙ্গে আরও এক ব্রত পালিত হয়। তা হল তুষ-তুষলী ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত মেয়েরা করে থাকে। কালো বা একরঙা গরুর টাটকা গোবর, নতুন আতপ ধানের তুষ, সরষে ও মূলার ফুল, দুর্বা, মাটির নতুন মালসা উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই ব্রততে গোবর ও তুষ দিয়ে একসাথে মেখে ১৪৪টি গুলি তৈরী করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে ১২৪, ৬২, ৩১টি গুলিও তৈরী করা হয়।

গুলিগুলোর মাথায় পাঁচগাছি করে দুর্বা আটকিয়ে মালসায় রাখা হয়। ১৪৪টি গুলির ক্ষেত্রে ব্রতীদের প্রতিদিন ৪টি করে ও শনি ও মঙ্গলবারে ৬টি করে এবং শেষদিনে অবশিষ্ট ৪টি করে গুলি নিয়ে পুজো করার নিয়ম। ব্রতীরা সকালবেলায় চারটে গুলি হাতে করে বা গুলির উপর হাত রেখে সরষের ফুল দিয়ে মন্ত্র পড়ে পূজা করে। তারপর মূলার ফুল দিয়ে প্রণাম মন্ত্র সারে। এরপর পুজো করা গুলিগুলো মালসায় রাখে। পৌষ সংক্রান্তির দিন পুজো শেষ করে তুষলীগুলো মালসায় তুলে নিকটবর্তী নদী বা পুকুরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

ভাঁজো

শস্যকেন্দ্রিক মেয়েলি ব্রতের অনুষ্ঠান হলো 'ভাঁজো'। সেই অনুষ্ঠানকে ঘিরে কুমারী ও সধবা মেয়েরা যে গান গায় তার নাম ভাঁজো গান। বর্ধমান ও বীরভূমে ভাঁজো গানের বেশ চল আছে। শস্য কামনা ও শস্য উৎপাদনের সঙ্গে এই ব্রতের যোগ। ব্রতের সূচনা ভাদ্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে শেষ হয় ঐ পক্ষের দ্বাদশীতে। ব্রতপালনে লাগে মুগ, মটর, ছোলা, অড়হর আর কলাই এই পঞ্চশস্য। ব্রত আরম্ভের আগের দিন একটা পাত্রে এই পাঁচটি শস্য একসঙ্গে কিছু পরিমাণ ভিজিয়ে রেখে পরদিন ষষ্ঠী পুজোয় সেগুলির নৈবেদ্য সাজিয়ে দিতে হয়। কিছু শস্য রাখতে হয় সরষে ও ইঁদুর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে একটি মাটির সরায়। প্রতিদিন স্নানের পর ব্রতীরা তাতে অল্প অল্প জল ঢেলে শস্যগুলিকে অঙ্কুরিত হতে সাহায্য করে। অঙ্কুরিত শস্য এই বিশ্বাস জাগায় যে বৎসরটি পর্যাপ্ত শস্যশালিনী হবে। অবশেষে শুক্লা দ্বাদশীর দিন চাঁদের আলোয় খোলা আকাশের নীচে শুরু হয় নাচগানের উৎসব। দ্বাদশীর দিনের অনুষ্ঠানটি আরও বিচিত্র। উঠানের মাঝখানে তৈরী করা হয় মাটির বেদী। বেদীর চারদিকে পাড়ার ব্রতীরা তাদের অঙ্কুরিত শস্যের সরাগুলিকে পরপর সাজিয়ে দেয়। বেদীটি চিত্রায়িত করা হয় পিটুলির গোলা দিয়ে। এর মুখ্য আল্পনাটি হল ইন্দ্রের বজ্রচিহ্ন কোথাও কোথাও মাটির ইন্দ্রমূর্তিও স্থাপন করা হয়। তারপর সারারাত ধরে ব্রতিনীরা বেদীর চারপাশে হাত ধরাধরি করে নাচে ও গান গায়। অনুষ্ঠান শেষ হয় রাত্রি শেষে একেবারে ভোরের দিকে। এরপর রাত্রি শেষে সরাগুলি মাথায় নিয়ে কাছাকাছি কোন পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের মধ্যেও উর্বরতাকেন্দ্রিক ধারণার প্রবাহ বর্তমান। ভাঁজো গান নারীব্রতের অঙ্গ। সুতরাং শস্য কামনা ও উর্বরতাবাদের সঙ্গে এই ব্রতের কামনা বাসনা ও গানের যোগ অনেকখানি। ভাঁজো গানে ব্রতিনীরা যে ছড়া কাটে -

'ভাঁজো লো কলকলানি, মাটির লো সরা
ভাঁজোর গলায় দেব মোরা পঞ্চফুলের মালা
এককলসী গঙ্গাজল, এক কলসী ঘি
বছরান্তে একবার ভাঁজো,
নাচবো নাতো কি?'[১১]

অম্বুবাচী ব্রত

উর্বরতাতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে মাতা বসুমতীকে এইভাবে পুজো করা হয়। এই ব্রত উদযাপিত হয় তিনদিন ধরে। প্রতি বছর ৭ই আষাঢ় থেকে তিনদিন পালন করা হয় অম্বুবাচী ব্রত। এই ব্রত নিয়ে লোকবিশ্বাস এমনটাই প্রচলিত আছে যে, এই তিনদিন মাতা বসুমতী ঋতুমতী বা রজ:স্বলা থাকেন। তাই এই তিনদিন এই বিশ্বাসে কোনোরকম আঘাত করা হয় না মাটি বা বসুমতীকে। তাই এসময় কৃষকদেরও জমিতে হালচাষ করা নিষেধ। এছাড়া কোদাল দিয়ে মাটি খোঁড়া, মাটিতে বীজ ছড়ানো সবই নিষেধ থাকে এই তিনদিন। ঐ তিনদিন অতিবাহিত হলে বাড়ির জামাকাপড় ধোয়া মোছা হয় এবং জমিতে বীজও ছড়ানো হয়। ঋতুমতী নারীর সঙ্গে যে ধরনের যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন - সেটাই প্রতিফলিত হয় বসুন্ধরার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ ও দক্ষিণবঙ্গের বিধবা মহিলারা এই ব্রত করে থাকেন। ৭ই আষাঢ়ের আগে শুকনো খাবার

রান্না করে রাখা হয় এই ব্রতচলাকালীন খাবার জন্য। কোনোরকম আগুন জ্বালানো হয় না এই কদিন। তাই শুকনো খাবার ছাড়াও কাঁচা দুধ, সাবু, ফল খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অসমে সধবা ও বিধবা উভয় মহিলারা এই ব্রত করে থাকেন। ব্রত চলাকালীন ব্রতিনীরা শয্যাত্যাগ পর্যন্ত করেন না, এমনকি মাটিতেও পর্যন্ত পা রাখে না। তাছাড়া এটাও পর্যন্ত বিশ্বাস করা হয় যে সমস্ত জীবজন্তু, পোকামাকড় মাটি খুঁড়ে থাকে যেমন শুয়োর, কেঁচো, পিঁপড়ে প্রভৃতি তারাও এই তিনদিন মাটি খোঁড়া থেকে বিরত থাকে। এই সময় থাকে বর্ষাকাল অর্থাৎ প্রচুর বৃষ্টিপাতের সময়। এইসময় স্বাভাবিক ভাবেই চারদিকে কচি সবুজ উদ্ভিদে ভরে ওঠে এবং বৃক্ষে নানা ফলফুল জন্মায়। তাই অসমে কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত আছে এই সময় মাটির সরায় জল ভরে তার মধ্যে শস্যবীজ রাখা হয়। তিনদিন পর সেই শস্য বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হলে তা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। অসমে কামাখ্যা মন্দিরে অম্বুবাচীর উৎসব বড়ো করে পালন করা হয়। ওই তিনদিন মন্দির বন্ধ রাখা হয়। কোনো রকম পূজা হয় না। তবে মন্দিরের বাইরে বসে বিরাট মেলা। দেশের নানা অঞ্চল থেকে সাধুসন্ন্যাসীরা এই মেলায় উপস্থিত হন। শুধুমাত্র অসমেই নয় পশ্চিমবাংলাতেও এই সময়ে বিভিন্ন কালীমন্দিরগুলি বন্ধ রাখা হয়। অসমের মানুষের মধ্যে লোকবিশ্বাস এখানে মন্দির গর্ভের কিছু অংশের মৃত্তিকা রজ:স্বলা হয়। কারণ ৫১তম সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা মন্দির। পুরাণ মতে এখানে সতীর দেহের যে অংশ এখানে পড়েছিল তা হল 'যোনীদ্বার' এই যোনীদ্বার রজ:স্বলা হবে এটাই তো স্বাভাবিক। তাই দেবীশক্তির অন্যতম পীঠ কামাখ্যা মন্দির এই অম্বুবাচী ব্রতের দ্বারা বসুমাতার রজ:স্বলা হওয়ার সাক্ষ্য বহন করছে। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে উর্বরতাকেন্দ্রিক ধারণা এটা গবেষক মহলে এবং পন্ডিতেরা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

নলপূজা / নলব্রত

কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন এই নলব্রত পালিত হয় তাই এর অপর নাম নল সংক্রান্তি। সাধারণত আশ্বিন মাসে ধান গাছে থোড় এসে যায়। তাই গর্ভবতী মেয়েদের মতো ধানগাছকে মাতৃরূপে কল্পনা করে গর্ভবতী হিসেবে সাধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। সাধ খাওয়ানোর উপকরণগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় দ্রুত সহজ বংশবৃদ্ধির লক্ষণ। এর মধ্যে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে Fertility Cult. মানকচু, মানকচুর ডাটা, ওল, আরও ডাটা জাতীয় গাছ, তালের ফোঁপরা, আতপচাল প্রভৃতি ঢেঁকিতে কুটে তার সঙ্গে ঘি আর মধু মিশিয়ে 'বরি' নামক গাছের পাতায় রেখে, সেটাকে নতুন পাটের দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। এবার নলগাছের ডগায় ওই উপকরণটিকে বেঁধে আসন্ন শস্যসম্ভবা ধান খেতে পুঁতে দিয়ে আসতে হয়। নলগাছটি পোঁতার সময় বলা হয়ে থাকে:

"আশ্বিন গেল, কার্তিক এল
ছোটো বড় ধান একসমান হল
এতে আছে ঘি
সাধ খাবে লক্ষ্মীর ঝি
এতে আছে মউ
সাধ খাবে লক্ষ্মীর বউ
এতে আছে ঝুটপাট
যত পোকামাকড়ের মাথা কাট্
এতে আছে ক্ষুধার মিন্দ্
ধান হবে মউল কান্দি
নল পড়লো ভুঁয়ে

যা শনি সব উত্তরমুয়ে।" (হাওড়া জেলা)[২]

'স্বর্গের জল মর্ত্যের জল
ধান ফলে গল গল।
পাশের ধান আল থাল,
আমার ধান শুধুই চাল
ধান ফলরে ফল" (মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা এলাকা)[৩]

বাঁকুড়া জেলার শরগাছ অর্থাৎ নলগাছকে পুজো করার পর সেগুলোকে ধানের খেতে এবং সার কুঁড়ে পুঁতে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, ভালো বৃষ্টি হবে ও জমিতে যথেষ্ট জল থাকবে, যার জন্য ফসল ভালো হবে। জমিতে নল পোতার সময় বলা হয় –

"আকাশের জল পাতালের নল
ধান বাড়ে গল গল"[৪]

বাড়ির পাশের সারকুঁড়ের একপাশ গোবর জল দিয়ে পরিষ্কার করে আলপনা এঁকে ঘট পেতে পুরোহিত নলগাছের পুজো করে থাকেন। নলগাছের পুজোর পর চাষি লক্ষ্মীর সাধভক্ষণ করাতে তার জমিতে যান। এবং জমির ঈশান কোণে পুতে দিয়ে আসে নলগাছটি। এই নল পূজার মধ্যে নিহিত আছে উর্বরতাকেন্দ্রিক চেতনা।

কার্ত্তিক ব্রত

আশ্বিন সংক্রান্তি থেকে কার্ত্তিক সংক্রান্তি পর্যন্ত এক মাস ধরে এই ব্রত করা হয়। কার্ত্তিক মাসে কুমারী মেয়েরা ভোরবেলা স্নান সেরে এসে তুলসিতলায় একটি গর্ত করে এটিকে পুকুর রূপে কল্পনা করে এখানে একতাল গোবর ও তার মধ্যে একটি নতুন ধানের শিষ গুঁজে দিয়ে পুজো করে। কুমারীদের মতে এটি শিব। শিব যেহেতু কার্তিকের পিতা তাই তাকে পূজন করা হয়। এই কল্পিত পুকুরের পাশে গণেশ সহ অন্যান্য পাঁচ দেবতার নামে বালি দিয়ে পিণ্ড তৈরী করা হয়। প্রতিদিন শিবসহ পঞ্চদেবতা পূজিত হন তুলসিপাতা দিয়ে। একটি থালায় পাঁচ মুঠো আতপচাল রেখে তার উপর হরিতকী, বিভিতকী, আমলকী, নারকেল, সুপুরি এই পঞ্চফল দিয়ে সাজানো হয়। ওপরে একটা প্রদীপ জ্বালানো হয়। ব্রতিনীরা থালাটি ধরে সূর্য বন্দনা করে মন্ত্র বলে:

"রথ সাজো রথ সাজো পড়ি গেলা গোল
রথ যাই কৈলাশ নগরে নাগিল।।
কৈলাশ নগরীতে যত পুরনারী ছিলা।
পঞ্চমানিক নিয়ে রথ বন্দিতে নাগিলা।।"[৫]

এরপর বৈকুণ্ঠপুরী, কুবেরপুরী, ইন্দ্রের পুরী, সূর্যের নগর ইত্যাদি পঞ্চনগরে রথ গিয়ে হাজির হয়। বন্দনার পর অর্ঘ্য দান -

"দুধ দেই অর্ঘ্যদানে বাছুরির ওঁইঠা (এঁটো)
গুড় দেই অর্ঘ্যদানে পিপিড়ার ওঁইঠা
ফল দেই অর্ঘ্যদানে বাদুড়ির ওঁইঠা
গঙ্গাজল, কষাফল, হরিতকী সবনু পদিষ্ঠা।"[৬]

মন্ত্রটি বলার পর এই কল্পিত পুকুরে সবটুকু ধুয়ে ফেলে দেওয়া হয় ব্রতের শেষ দিনে। এই ব্রতের দ্বারা কুমারী মেয়েরা সুপাত্র ও সুপুত্র কামনা করে।

তবে সধবা নারীদের ক্ষেত্রে এই কার্তিক ব্রতের নিয়মটা একটু ভিন্ন। সধবারা এই ব্রত পালন করেন কার্ত্তিক মাসের শেষ পাঁচদিন। এই শেষ পাঁচদিনকে বলা হয় পঞ্চক। এই পঞ্চক ব্রত সধবারা পালন করেন কঠিন নিয়ম নিষ্ঠায়। এই পাঁচদিন অন্ন গ্রহণ করতে নেই, ফলমূল খেয়ে দিনযাপন করার নিয়ম আছে। এই শেষ পাঁচদিনে গোচোনা পান করারও রীতি আছে। কার্তিক ব্রতে আলপনা আঁকা হয় পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে এই পঞ্চগুঁড়ি হল চালের গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, বেলপাতার গুঁড়ো, আমলকী পাতার সবুজ গুঁড়ো, লালমাটি, তুষ, পোড়া কালো রং। আলপনার উপকরণগুলি যদি একটু লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে এই উপকরণগুলি জমির উর্বরতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এই কার্ত্তিক ব্রতও একটি উর্বরতাকেন্দ্রিক ব্রতাচার।

করম পরব / জাওয়া পরব

বাংলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট কৃষিকেন্দ্রিক পরব হল করম পরব। এই পরবটি ভাদ্র মাসে ৫ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। করম শুধুমাত্র কুমারী মেয়েদের উৎসব। এ উৎসবে একটি বাঁশের তৈরি বিশেষ ঝুঁড়ি (দাওড়া) মাটি দিয়ে ভর্তি করা হয়। একাধিক কুমারী মেয়েরা ঐ মাটির 'দাওড়া'-টির মধ্যে ভূট্টা, অড়হড়, কুর্থি, ছোলা, মুগ সর্বমোট পাঁচরকম শস্য ছড়িয়ে দেয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ নির্ধারিত অংশে পাঁচ দিন ধরে জল দিতে থাকে। পাঁচ দিনের পর বীজ থেকে অঙ্কুর বের হওয়ার পর উৎসবের সূচনা। কুমারী মেয়েরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ও কঠিন নিয়মের মধ্যে দিয়ে এইসব আচার পালন করে। বীজগুলি থেকে অঙ্কুর বের হওয়ার পর এই পরবের তৃতীয় অংশের সূচনা হয়। এই পরবের তৃতীয় অংশ হল 'জাওয়া পাতা'। বীজের অঙ্কুরোদগমের পর হলুদ ও সরষের তেল দিয়ে সেগুলিকে রং করে দেওয়া হয় – যার নাম 'জাওয়া পাতা' (জাওয়া>অঙ্কুর) (জাওয়া>অপর অর্থ বপন) যে ডালায় একরকমের বীজ থাকে তাকে বলে 'একাঙ্গি' আর যে ডালায় মেশানো বীজ থাকে তার নাম 'সাঙ্গা' জাওয়া। জাওয়া পাতার দিন ব্রতিনীরা তেল, সাবান বিনা রুক্ষ ভাবে থাকে। চুল ভেজায় না বা বাঁধেও না। এই রকম পরবের মাধ্যমে কুমারীদের মনে, শরীর শুদ্ধ রাখা, সন্তান কামনা করা ও সন্তান ধারণ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হয়। এজন্য স্নান সেরে বিশুদ্ধ হয়ে 'দাওড়া' তে মাটি বা বালি ভর্তি করে শস্যদানা পুঁততে হয়। এই ডালা বা 'দাওড়া' হল সন্তান ধারনের আধার। এই 'দাওড়া'টিকে ধরিত্রী মাতা রূপে বিশ্বাস করা হয়। বিশুদ্ধ এই শস্যের আধারটি গর্ভবতী রমণীর সঙ্গে তুলনীয়। গর্ভে সন্তান থাকাকালীন নারীরা যেমন ভাবে নিজেদের সন্তানকে সুস্থ রাখতে নানা বিধিনিষেধ পালন করে এক্ষেত্রে 'জাওয়া' বা 'দাওড়া'টিকে তেমনি সুরক্ষিত ভাবে রক্ষা করে কুমারী মেয়েরা। এক্ষেত্রে ব্রতিনীকে কঠোর নিয়ম পালনের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। যেমন শরীরের কোনো অংশ চুলকানো যাবে না। চুল আঁচড়াবে না কারণ অঙ্কুরিত শস্য ভূমি বা মৃত্তিকা থেকে উৎপাটিত হতে পারে। তাছাড়া ব্রতিনীকে আগুনের কাছাকাছি যাওয়া যাবে না। বিশ্বাস করা হয় আগুনের তাপে শস্যের অঙ্কুর শুকিয়ে যেতে পারে। মাটিতে শৌচকর্ম করে বিশুদ্ধ ধরিত্রী মাতাকে কলুষিত করা যাবে না। এই রকম বিবিধ নিয়ম কুমারী ব্রতিনীকে মেনে চলতে হবে। অঙ্কুরিত শস্য থেকে নির্গত উদ্ভিদ থেকে অনুমান করা হয় সেই বছর ধরিত্রী কেমন ভাবে শস্যশালিনী হয়ে উঠবে। 'জাওয়া' ব্রতের মাধ্যমে শস্যের সমৃদ্ধি কামনার সঙ্গে সঙ্গে কুমারী মেয়েদের ভবিষৎ জীবনের উর্বরতা বৃদ্ধির যাদুবিশ্বাসকেও বহন করে।

ডাক সংক্রান্তি

'ডাক' শব্দের অর্থ হল ডাকা বা আহ্বান করা। সাধারণত আশ্বিন মাসের শেষ দিনে পালিত হয় 'ডাক সংক্রান্তি'। দেবী লক্ষ্মীকে সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে কৃষিসমাজ গণ্য করে। আমাদের দেশে ধানগাছকে দেবী লক্ষ্মী হিসাবে মানা হয়। আশ্বিন সংক্রান্তিতে যখন জমিতে ধান গাছের বাড়বাড়ন্ত, প্রতি ধানের গাছে কচি ধানের শিষ বেরোয় তখন ধানগাছকে গর্ভবতী নারীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেহেতু ধান গাছকে মা লক্ষ্মী হিসাবে কল্পনা করা হয় তাই মা লক্ষ্মীকে গর্ভিনী জ্ঞানে

কল্পনা করে ডাক সংক্রান্তির দিনে তাকে সাধ খাওয়ানো হয়। আমাদের সমাজে গর্ভিনী নারীকে যেভাবে সাধভক্ষণ করানো হয় তাতে লোকবিশ্বাস থাকে যে একই রকমভাবে আরেকটি শরকাঠির মাথায় মানকচুর পাতায় করে কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা হলুদ, কাঁচামান, নারকেল, তালের আঁটি, কাঁচা দুধ, আতপচাল, সন্দেশ, শশা এই নয় রকম ফল দিয়ে বেঁধে শুকনো কলাপেটো দিয়ে শিকে নির্মাণ করে বেঁধে দিয়ে বাড়ির সারগর্তে (যেখানে গোবর ফেলা হয়) সেখানে পুঁতে দেওয়া হয়। একই সাথে ছড়া কাটা হয় –

১। "ডাকে ডাকে একুশ ডাক
ছোটো বড় এক ডাক
আশ্বিন গেল কার্তিক এল
মা লক্ষ্মী গর্ভে এল" (হুগলী জেলা)[৭]

২। "আকাশের জল পাতালের জল
ধান হবে হল হল" (হুগলি)[৮]

এছাড়া আরেক ভাবে দেখা হয় এই ডাক সংক্রান্তিকে। কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে কৃষক সমাজে ডাক ও খনার বচন মেনে চলা হয়। এই ডাক সংক্রান্তি পালিত হয় ডাক পুরুষকে কেন্দ্র করে। এই ডাক পুরুষের পরিচয় তিনি একজন বৌদ্ধতান্ত্রিক অথবা দেবতা। কেউ বলেন তিনি একজন মুসলিম পুর্ববঙ্গীয় ব্যক্তি, আবার কৃষকসমাজে প্রচলিত এই ডাক পুরুষ হলেন একজন প্রাচীন মহাপুরুষ। যার জন্ম হয়েছিল এই বাংলায়। কৃষক সমাজে এই মিথ প্রচলিত আছে ডাক পুরুষ একজন শক্তিশালী ব্যক্তি যিনি ডাক সংক্রান্তির আগের দিন বিধাতার কাছে যেতেন লাঠি ও মশাল নিয়ে। আর বিধাতার কাছে পৃথিবীর মানুষের সাংসারিক ও শারীরিক দুঃখের কথা জানিয়ে আসতেন। এবং বিধাতার থেকে শিখে আসতেন নানারকম শারীরিক ব্যায়াম, মন্ত্র ঔষধীর শিক্ষা। যা ছিল মানুষের সুস্থ থাকার চাবিকাঠি। তাই সেই প্রাচীন কথাকে স্মরণ করে সংক্রান্তির আগের দিন রাতের বেলা ছেলে ও যুবকেরা দল বেঁধে বাঁশের লাঠি, মশাল জ্বালিয়ে কুলো পেটাতে পেটাতে মাঠে যায়। নানারকম কসরৎ দেখায় ও খেলা করে থাকে। রাতের শেষে ভোরের দিকে নদী বা পুকুর এর থেকে জল নিয়ে আসে একে বলা হয় 'ডাকজল'। কৃষক পরিবারের প্রত্যেকে নিমপাতা ও তালশাঁস খাওয়ার পর ওই ডাকজল পান করেন। তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস কাজ করে ওই ডাকজল পান করলে সারা বছর তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আবার কোনো কোনো এলাকায় রাতের শেষে সংক্রান্তির ভোররাতে ছেলেরা সারা পাড়া কুলো পেটাতে পেটাতে ঘুরে বেড়ায়। আর ছড়ার মাধ্যমে বলতে থাকে মা লক্ষ্মীর গর্ভধারণের কথা। হাতের পাটকাঠির আগুন জ্বালিয়ে মশাল জ্বালানো হয় এবং তা নিয়ে ধান খেতের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো হয় আর একই সাথে ছেলেরা ছড়া কাটতে থাকে:

"আশ্বিন যায় কার্তিক আসে
মা লক্ষ্মী গর্ভে বসে
আমন ধানের সার বসে।
এপারের পোকামাকড় ওপারেতে যায়
ওপারের শিয়াল কুকুরে ধরে ধরে খায়"[৯]

এভাবে মশাল জ্বালিয়ে খেতের চারপাশে ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য ধানের জমির পোকামাকড় তাড়ানো। আর মা লক্ষ্মীকে সাধ দেওয়ার অনুসঙ্গে এই বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে এই লোকাচারটির সাথে জমির উর্বরতার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র আছে।

উপসংহার

আজও পৃথিবীর নানা প্রান্তে উর্বরতাকে কেন্দ্র করে নানা বিশ্বাস সংস্কার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কখনো বৃক্ষপূজা, কখনো নরনারীর অবাধ মিলন, আবার কখনো অন্তঃসত্ত্বা নারীর স্পর্শে লুকিয়ে থাকা উর্বরতা কেন্দ্রিক যাদুবিশ্বাস। যা প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নিষ্ঠাভরে পালন করে আসছে। এই সকল ঐতিহ্যবাহী পরম্পরার মাধ্যমে সযত্নে লালিত হবে উর্বরতা কেন্দ্রিক ধ্যান ধারনা, লোকাচার, বিশ্বাস ও সংস্কার। কারণ মানুষের চিরকালীন সুপ্ত বাসনা সম্পদ বৃদ্ধি। আর উর্বরতা তন্ত্রের মাধ্যমে চিরকাল এই ধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। বর্তমান আধুণিক নাগরিক সমাজ এই সকল উর্বরতা কেন্দ্রিক ব্রত পার্বণ থেকে বর্তমানে বহুযোজন দূরে। তবুও বাংলার গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা এখনো তাদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে। পূর্ব পুরুষের কাল থেকে পালিত হয়ে আসা লোকাচারগুলিকে পরম্পরাগত মেনে আসছে গ্রামবাংলার মানুষ। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তার মূল্যায়ন আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। কৃষির সঙ্গে উর্বরতা তন্ত্রের এই সংযোগ অন্বেষণের ক্ষেত্রে এসকল উর্বরতা কেন্দ্রিক লোকাচার ভবিষ্যতে গবেষণার নতুন দিক উন্মোচন করবে।

সূত্র নির্দেশ:

১. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, (২০১৩), *বাংলার ব্রত,* গাঙচিল, পৃ. ৭৫।
২. সরকার, মাধুরী, (২০১৯), *ব্রত সমাজ ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপণি, পৃ. ১৪৫।
৩. *তদেব,* পৃ. ১৪৫।
৪. *তদেব,* পৃ. ১৪৫।
৫. সরকার, মাধুরী, (২০১৯), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৩৯।
৬. *তদেব,* পৃ. ১৩৯।
৭. সাক্ষাৎকার: ব্যাসদেব ঘোষ, বয়স ৫৫, পেশা- কৃষিকাজ, ঠিকানা- গ্রাম: ফরিদপুর, থানা: গুড়াপ, জেলা: হুগলী।
৮. *তদেব।*
৯. সরকার, মাধুরী, (২০১৯), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৪৩।